OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 190 - 199
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ মানব মনস্তত্ত্ব

মো. জসিম উদ্দিন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID: jashim.bangla@du.ac.bd

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
The struggle, Human existential, crisis, Naturalism, Realism, Psychoanalytic theory, Social-reality.

Abstract
Manik Bandyopadhyay is a renowned artist of Bengali short stories. Along with novels, he has also written many short stories. The existential crisis of the lower and middle classes of society, the constant struggle for survival and the complex crises of the mind are depicted to the greatest extent in his stories. The present article discusses the complexity of the human psyche in Manik Bandyopadhyay's short stories.

Discussion

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী এক অস্থির সময় পর্বে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬)। যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের অস্থিরতা, হাহাকার, অস্তিত্বসংকট এবং মানব-মূল্যবোধের বিপন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাহিত্যসত্তার উন্মেষ ও বিকাশ। ঔপন্যাসিক হিসেবে সর্বাধিক সুখ্যাতি অর্জন করলেও ছোটগল্পকার হিসেবেও তাঁর স্বীকৃতি সর্বব্যাপী। সাহিত্যজগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ মূলত ছোটগল্প রচনার মধ্য দিয়েই। সমাজের নিপীড়িত-নিগৃহীত সাধারণ মানুষের জীবনাচারণ, তাদের বেঁচে থাকার তীব্র সংগ্রাম, আশা-আকাঙ্ক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা প্রভৃতি বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ দেখা যায় মানিকের ছোটগল্পে।

মাত্র বিশ বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে তর্কসূত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন ছোটগল্প 'অতসীমামি'। এটি *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে)। অতঃপর তিনি লিখেছেন অবিরাম এবং ২৮ বছরের সাহিত্যিক-জীবনে উপন্যাসের পাশাপাশি লিখেছেন প্রায় ২০০টি ছোটগল্প। এ-গল্পগুলো জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে ১৬টি গল্পগ্রন্থে এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত বিভিন্ন গল্প-সংকলনে। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে - *অতসীমামি* (১৯৩৯), *প্রাগৈতিহাসিক* (১৯৩৭), *মিহি ও মোটা কাহিনী* (১৯৩৮), *সরীসৃপ* (১৯৩৯), *বৌ* (১৯৪৩), *সমুদ্রের স্বাদ* (১৯৪৩), *ভেজাল* (১৯৪৪), *হলুদপোড়া* (১৯৪৮), *আজ কাল পরশুর গল্প* (১৯৪৬), *পরিস্থিতি* (১৯৪৬), *খতিয়ান* (১৯৪৭), *মাটির মাশুল* (১৯৪৮), *ছোট বড়* (১৯৪৮), *ছোট বকুলপুরের যাত্রী* (১৯৪৯), *ফেরিওলা* (১৯৪৩) এবং *লাজুকলতা* (১৯৫৪)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমবিবর্তনবাদী প্রতিভা। জীবনের সৃষ্টিশীল সময়পর্বে প্রতিনিয়ত তাঁর সাহিত্যবোধে সাধিত হয়েছে রূপ-রূপান্তর। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়া-সাপেক্ষে তাঁর ছোটগল্পসমূহকে দুটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ের সময়সীমা ১৯২৮ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত; অর্থাৎ সাহিত্যপথে যাত্রারম্ভ থেকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান পর্যন্ত সময়কাল। এ-পর্যায়ের গল্পসমূহে মূলত মানব-মনের জটিল গভীর রহস্য ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫৬

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জীবনাবসান পর্যন্ত। এ পর্যায়ের গল্পে মনোজটিল চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিষয় বিশ্লেষিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ছাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর রচিত প্রায় সকল গল্পেই মানব মনস্তত্ত্বের জটিল বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের আলোকে। পাশাপাশি তাঁর অনেক গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা।

'অতসীমামি' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প। এই গল্পটি মানিক লিখেছেন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে। রোমান্টিক ভাবাবেগে আকীর্ণ এই গল্পে শরৎচন্দ্রের রচনার প্রভাব লক্ষণীয়। দারিদ্র্য এবং আত্মসম্মানবোধ- এই দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে নির্মিত হয়েছে এ-গল্পের ভাবলোক। অতসীমামি এবং তার স্বামী যতীন্দ্রনাথের জীবন চরম দারিদ্রব্যঞ্জক হলেও আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনোভাবেই তাঁরা অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্য নিতে রাজি নন। লোকমুখে যতীন্দ্রনাথের বংশীবাদনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে গল্পকথক একদিন নিজেই উপস্থিত হন যতীন্দ্রনাথের বাঁশির সুর শুনতে। কিন্তু সেখানে গিয়ে গল্পকথক উপলব্ধি করেন -

> "তাঁর বাঁশি বাজানর যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড় আর ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও একটা স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা নয় হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট-বার করা তিন কালের বুড়োর মত নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা।" (অতসীমামি)

উপর্যুক্ত বর্ণনাংশ থেকে উপলব্ধি করা যায় অতসীমামিদের আর্থিক দুরবস্থার স্বরূপ। এই দারিদ্রজীর্ণ পরিবেশে যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গল্পকথকের মনে হল - 'ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটি টকটকে আগুন বার হয়ে পড়ল।' চরম দুঃখ-দৈন্যময় জীবনযাপন সত্ত্বেও মন-প্রাণ এবং সমগ্র সত্তা দিয়ে বাঁশি বাজান যতীন্দ্রনাথ এবং বাঁশি বাজাতে বাজাতে তার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় রক্ত। তবুও তিনি হাল ছাড়েন না; পরাস্ত হন না। তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর সংগ্রামশীল জীবনযাত্রা সমকালীন মধ্যবিত্ত মানসের জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমালোচকের মতে -

> "তিরিশদশকের রক্ত মুখে ওঠা কঠোর জীবন যন্ত্রণার সঙ্গে যতীনমামার যন্ত্রণাকাতর জীবনের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে আর প্রতি পদে পদে মার খাওয়া জীবনচেতনার সঙ্গে পরাজিত নায়কের মর্মযন্ত্রণার অপূর্ব মিল আছে। সেজন্য তিরিশ দশকের মর্মান্তিক এই গল্প মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনবেদ হয়ে উঠেছিল।"[১]

রোগকাতর অতসীমামীর চিকিৎসার প্রয়োজনে যতীনমামা তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঁশি এবং মাথা-গোঁজার ঠাঁই বাড়িটি বিক্রি করে দিলেও কারো কাছে হাত পাতেননি অর্থের জন্য; বিসর্জন দেননি ব্যক্তিত্ববোধকে। মধ্যবিত্ত চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য আমাদের সমাজে দুর্লভ নয়। যতীনমামার কাছ থেকে গল্পকথক বাঁশিটি কিনে নিলে অতসীমামি যেন প্রাণ ফিরে পান। কারণ বাঁশি বাজালে যতীনের আর বেশি দিন বাঁচার আশা নেই। তাই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ যতীনমামা শেষ তিন বছর আর বাঁশি বাজাননি, কিন্তু তাঁর প্রাণপ্রিয় বাঁশিটির জন্য প্রতিনিয়ত ভুগেছেন অন্তর্দাহে; মানসিক যন্ত্রণায়।

কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদানের প্রাকপর্যায়ে মানিক লিখেছেন 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পটি। গল্পটি মূলত সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের নিরন্তর বেঁচে থাকার সংগ্রামের বাস্তব চিত্র। প্রথম গল্পসংকলন *অতসীমামির* অন্যান্য গল্প থেকে একেবারে আলাদা জাতের এক আশ্চর্য সার্থক গল্প এটি।[২] এ-গল্পে লেখক দেখিয়েছেন দুর্বিষহ অভাব-অনটন, গ্লানিজর্জর জীবনের মধ্যেও কিছু মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম; যাদের নেই আত্মহত্যা করার অধিকারও। তাইতো অসুস্থ-অসহায় নীলমণি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে প্রবল বর্ষণস্নাত রাতে ভগ্ন শতচ্ছিদ্রযুক্ত ঘরে কোনোমতে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং উপলব্ধি করে 'বেঁচে থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন'। নীলমণি তার পারিবারিক এই সংকটকে একান্তই তার ব্যর্থতা বলে মনে করে এবং কারও ওপর প্রতিশোধ নিতে না পেরে অসহায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করে। অবশেষে নিজের ভগ্নপ্রায় জীর্ণ কুটিরে ঝড়ের তাণ্ডবে টিকতে না পেরে নীলমণি তার পরিবার নিয়ে কোনোমতে আশ্রয় নেয় সরকার বাড়ির কাছারিতে। কিন্তু বেঁচে থাকার এ-নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যেও তার মনোলোকে অবিরাম প্রতিধ্বনিত হয় -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্ত কাল? কাল কি করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?" (আত্মহত্যার অধিকার)

নীলমণির মনের এই অভিব্যক্তি আসলে সমাজের বেঁচে থাকার সংগ্রামে নিরন্তর ছুটে চলা সকল মানুষের। তাদের এই অস্তিত্ব-সংকট এবং সংকট থেকে উত্তরণের উপায় গল্পকারেরও জানা নেই। বেঁচে থাকার এ-সংগ্রাম অনিঃশেষ। এ সংগ্রাম যুগ-যুগান্তরের।

'প্রাগৈতিহাসিক' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পের প্রধান চরিত্র ভিখু। তার জীবন-জীবিকার উৎস দস্যুবৃত্তি। প্রাগৈতিহাসিক দুই প্রবৃত্তি 'উদরতাড়না' ও 'যৌনাবেগ' কীভাবে মানবজীবনকে নিয়ন্ত্রণ কিংবা চালিত করে তা এ-গল্পে প্রদর্শিত হয়েছে ভিখু চরিত্রের মাধ্যমে। একদা দলবল নিয়ে দস্যুবৃত্তি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে একটি হাত চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে যায় তার। তবু তার উদ্দাম প্রাণশক্তিতে একটুও ভাটা পড়ে না। অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিলেও তার বিপুল জীবনোদ্যমে কোনো ঘাটতি দেখা যায় না -

> "সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রত্যেকটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। অভ্যস্ত বুলি আওড়াইয়া কাতরভাবেই সে এখনো ভিক্ষা চায় কিন্তু ভিক্ষা না পাইলে তাহার ক্রোধের সীমা থাকে না।...নদীর ঘাটে মেয়েরা স্নান করিতে নামিলে ভিক্ষা চাহিবার ছলে জলের ধারে গিয়া দাঁড়ায়। মেয়েরা ভয় পাইলে সে খুশি হয় এবং সরিয়া যাইতে বলিলে নড়ে না, দাঁত বাহির করিয়া দুর্বিনীত হাসি হাসে। রাতে স্বরচিত শয্যায় সে ছটফট করে।" (প্রাগৈতিহাসিক)

উদরের জ্বালা নিবৃত্ত হলেও এক পর্যায়ে ভিখুর যৌনক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠে। তাই ভিখারিনী পাঁচীকে বিয়ে প্রস্তাব দেয় সে। কিন্তু পাঁচীর সঙ্গী বসির এতে অন্তরায় হিসেবে দেখা দিলে বসিরকে নৃশংস উপায়ে হত্যা করে গভীর রাত্রে পাঁচীকে নিয়ে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায় সে। গল্পশেষে ভিখুর এই প্রবৃত্তি-পরিণামকে অসাধারণ বাস্তবতামণ্ডিত করে প্রদর্শন করেছেন গল্পকার -

> "...যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।" (প্রাগৈতিহাসিক)

মূলত প্রাগৈতিহাসিক এই প্রবৃত্তিকে প্রত্যেকটি মানুষ তার অবচেতন চেতনাস্তরে লালন করে। এই প্রবৃত্তি সৃষ্টির ঊষালোক থেকেই মানব দেহের অভ্যন্তরস্তরে সংগুপ্ত। সিগমুন্ড ফ্রয়েড যেটিকে চিহ্নিত করেছেন 'লিবিডো' নামে। মানুষের সকল কর্মকাণ্ড তথা জীবনীশক্তির মূল যে লিবিডো তথা যৌনাকাঙ্ক্ষা তাই যেন ভিখু চরিত্রের মাধ্যমে অসাধারণ শিল্পকৌশলে 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে রূপায়িত করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'টিকটিকি' মনোবিশ্লেষণধর্মী গল্প। এ-গল্পে মানিক নির্মম আঘাত হেনেছেন সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। এই আধুনিক সভ্যযুগেও যে অনেকের সংস্কারমুক্তি ঘটেনি তা প্রদর্শিত হয়েছে এই গল্পে। জ্যোতিষী জ্যোতিষার্ণব - 'অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে', ঘটনাচক্রে তার মনে দৃঢ়মূল ভিত্তি পায় টিকটিকি-সংস্কার। সকালে স্ত্রীর মুখে মৃত্যুপ্রসঙ্গ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিকটিকির সম্মতিসূচক ডাক এবং বিকেলে স্ত্রীর মৃত্যু - এ কাকতালীয় বিষয়টিই জ্যোতিষার্ণবের মনে জন্ম দেয় প্রবল সংস্কারের। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার যে একজন মানুষের সত্যদৃষ্টি লুপ্ত করে দেয় এবং তাকে বাস্তবতাবিমুখ করে তোলে তা লেখক প্রদর্শন করেছেন এভাবে -

> "অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যার নখদর্পণে, সেও বুঝতে পারে না ব্যাপারখানা কী। তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলবে মনে করার আগেই মাথার উপর কড়িকাঠে যে টিকটিকির লেজ নড়তে আরম্ভ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> করেছিল, তার ছেলেমেয়ের মা মরণের কথা বলার পরে সেই টিকটিকিটাই যে আর-একটা টিকটিকিকে তার ছেলেমেয়ের মা হতে ডেকেছে, এইটুকু কেবল জ্যোতিষার্ণব জানে না।" (টিকটিকি)

টিকটিকি সম্পর্কিত কুসংস্কার যে ভিত্তিহীন, মানুষের অন্ধ বিশ্বাসমাত্র এবং এর পেছনে যে সুযোগসন্ধানীর অপউদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল থাকে - তা বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এ-গল্পে রূপায়িত করেছেন গল্পকার। সমাজ প্রচলিত এ-কুসংস্কার মানুষের মনকে কীভাবে বিকল করে দেয় তা ফুঠে উঠেছে মনোবিশ্লেষণধর্মী এ-গল্পের মাধ্যমে।

'শৈলজ শিলা' গল্পেরও কেন্দ্রীয় সমস্যা 'লিবিডো' কেন্দ্রিক। সিগমুন্ড ফ্রয়েড সর্বযৌনবাদমূলক যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা মানিকের অনেক রচনায় ব্যবহৃত হলেও এই গল্পে এ-তত্ত্বের ব্যবহার হয়েছে সার্থকভাবে। নিজের বাল্যবিধবা কন্যার গর্ভে ভ্রূণস্থাপনের ফলে জন্ম হয় শিলার। জন্মের পর থেকে শিলাকে যে আদর-যত্নে প্রতিপালন করেছে, সে-ই তার প্রতি যৌনানুভবে জেগে ওঠে। পঞ্চদশবর্ষীয়া শিলার রূপসৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে তারই প্রতিপালক, যিনি এ-গল্পের কথক। এ প্রসঙ্গে তার আত্মভাষ্য লক্ষ করা যাক -

> "মেয়েটা যে এত সুন্দরী এ যেন আমার অবিশ্বাস্য সুখ। কত কি মনে হয়। পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে আমি যেন একেবারে কৈশোরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াই, ওর ওই টানা চোখ আর রাঙা ঠোঁট আর অপূর্ব গঠনতনু আমাকে সেইখানে আটকে রাখে।" (শৈলজ শিলা)

কিন্তু আশ্রয়দাতা প্রৌঢ়ের এই লিবিডোতাড়িত কামনা থেকে সযত্নে নিজেকে আগলে রাখে শিলা। আশ্রয়দাতার মনে হয় 'শৈলে যার জন্ম, শিলা যার নাম সে শিলার মত শক্ত হইবে জানি, কিন্তু চিরকাল রসে ডুবাইয়া রাখিলেও শিলা কেন গলিবে না ভাবিয়া মাথা গরম হইয়া উঠে।' স্পষ্টতই এ-ভাবনা ব্যক্তির অবচেতন স্তর-আশ্রিত 'ইদম' প্রবৃত্তিজাত; একান্তই প্রাগৈতিহাসিক। গোপিকানাথ রায় চৌধুরীর অভিমত এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় -

> " 'শৈলজ শিলা' গল্পে পালক পিতা নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়ে যৌবনপ্রাপ্তা পালিতা কন্যার প্রতি যে উন্মত্ত কামনায় বিকৃত-বুদ্ধি হয়েছেন, তার মধ্যেও বিকৃত যৌন মনস্তত্ত্বের প্রতি লেখকের ঐকান্তিক প্রবণতাই সূচিত হবে।"[৩]

'সিড়ি' মনোবিশ্লেষণধর্মী প্রতীকাশ্রয়ী গল্প। গল্প-বর্ণিত তিনতলা বাড়ি, চৌষট্টি সিঁড়ি এবং বাড়ির মালিক মানব ও ইতির সম্পর্কের বিশ্লেষণ এই গল্পের মৌল ভিত্তি। বাড়িটিতে যে সব ভাড়াটিয়ার বসবাস তারা সকলেই নিম্নবিত্তভুক্ত এবং প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রামরত। তাদের জীবন মানবেতর, হতশ্রীদশাগ্রস্ত, অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর। একটি দৃষ্টান্ত -

> "ছেলেটার পাঁচড়ার রস ভাল না লাগায় থেকে থেকে পাঁচড়া ত্যাগ করে কয়েকটি মাছি উড়ে যাচ্ছে এঁটো বাসনে আর উচ্ছিষ্ট ভাল না লাগায় থেকে থেকে কয়েকটা মাছি এঁটো বাসন ত্যাগ করে উড়ে এসে বসছে ছেলেটার পাঁচড়ায়।" (সিঁড়ি)

এই ছেলেটিরই বোন ইতি। শারীরিক ভাবে পঙ্গু হলেও বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে প্রেমের অভিনয় করে বাড়ির মালিক অসমবয়সী মানবের সঙ্গে। প্রেমের বিনিময়ে মানবের কাছ থেকে কয়েক মাসের বকেয়া ভাড়া কাটিয়ে ঋণের অজুহাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের ফন্দি আঁটে ইতি। ইতি রূপসৌন্দর্যহীন পঙ্গু; অস্তিত্বরক্ষার অনিবার্য তাগিদে সে বিকৃতরুচি বাড়িওয়ালার ফাঁদে পা দিয়েছে - এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, জীবনযুদ্ধে সে ছিল নিরুপায়। তাই ইতি তিনতলা বাড়ির চৌষট্টিটি সিঁড়ি পেরিয়ে ছাদের চিলেকোঠায় মানবের ঘরে দিনের প্রথম প্রহর কাটাতে অস্বস্তি বোধ করে না। চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দুজনের চেহারাতেই দেখা যায় পরিতৃপ্তির ছাপ। কিন্তু প্রণয়ের নামে ইতির এই ছলনা তার মা কিংবা প্রতিবেশীর দৃষ্টি এড়ায় না। তার প্রতিবেশি সুধা তাই ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে তাকে উদ্দেশ্য করে বলে -

> "তুই মর ইতি, মর তুই, গোল্লায় যা। পা না তোর খোঁড়া? পায়ে তুই না সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না? সিঁড়ি ভাঙতে পারিস না তো, যমের বাড়ি যাস না কেন তুই?" (সিঁড়ি)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আর্থিক অসামর্থের কারণেই মূলত ইতিকে প্রণয়ের অভিনয় করতে হয় বাড়িওয়ালা মানবের সঙ্গে। এই সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করে মানব। মানব ও ইতি দুজনেই তাদের অপউদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে করতে নীতি-নৈতিকতার সর্বনিম্ন সিঁড়িতে অবনমিত হয়। প্রতীকীভাবে এ-বক্তব্যই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে এই গল্পে। জনৈক সমালোচকের মতে -

> "ইঙ্গিতগর্ভ সংকেতময় ভাষায় প্রতীকীব্যঞ্জনার দীপ্ত সৃষ্টি, লেখকের স্নায়ু-টানটান নিরাসক্তি, স্বল্প পরিসরের কাহিনীবৃত্তে জীবনবোধের উজ্জ্বল প্রস্ফুটন প্রভৃতির মাধ্যমে মানিকের যেসব গল্প শিল্পসাফল্যের চূড়াস্পর্শ করেছে, 'সিঁড়ি' তার মধ্যে অন্যতম।"[৪]

মানিক রচিত মনোবিশ্লেষণধর্মী অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'সরীসৃপ'। অর্থলোলুপতা ও স্বার্থপরতা কীভাবে মানুষকে নিয়ে যায় বন-জঙ্গলের সরীসৃপ বা পশুদের কাতারে তার সফল চিত্রায়ণ ঘটেছে এই গল্পে। চারু-বনমালী-পরী এই তিনটি চরিত্রের অসুস্থ ও কদর্য জীবনচিত্র উন্মোচিত হয়েছে এই গল্পে। স্বামীর মৃত্যুর পর চারুর সমস্ত সম্পত্তি চলে যায় বনমালীর নিয়ন্ত্রণে। যে বনমালী এক সময় চারুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ছিল, আজ সেই বনমালীর আশ্রয়েই কোনোরকমে টিকে থাকতে হচ্ছে চারু আর তার একমাত্র সন্তান ভুবনকে। এমতাবস্থায় চারুর ছোটবোন অকালবিধবা পরীর আগমনে তাদের জীবনে শুরু হয় নতুন সংকট। পরী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বনমালীর কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয়। ছোটবোনের এই অধোগতি মেনে নিতে না পেরে তাকে হত্যার চক্রান্ত করে চারু; কিন্তু তা বুমেরাং হয়ে যায়। চারুর মৃত্যুর পর বনমালী চারুর সন্তান ভুবনকে আপন করে নেয়। এই ব্যবস্থা মানতে না পেরে পরী ভুবনকে সরিয়ে দেয় দৃশ্যপট থেকে। অতঃপর ভুবন প্রসঙ্গে বনমালীর মনোভঙ্গি এবং গল্পকারের ভাষ্য আমাদের মনে নতুন ভাবনা উদ্রিক্ত করে -

> "...ঠিক সেই সময় মাথার উপর দিয়া একটা এরোপ্লেন উড়িয়া যাইতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেটা সুন্দরবনের উপর পৌছিয়া গেল। মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বনের পশুরা যেখানে আশ্রয় লইয়াছে।" (সরীসৃপ)

মানুষের স্বার্থপরতা ও পাশবপ্রবৃত্তি উপস্থাপন সূত্রে গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ ও পশুদের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য নেই। বোধকরি সরীসৃপের মতো হীন কুটিল মানুষের সঙ্গ বনের পশুরও কাম্য নয়।[৫] চারু ও পরীর বনমালীর নিকট আত্মসমর্পণকে অনেক সমালোচক নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অনেকের মতে এর কারণ হচ্ছে নিতান্তই যৌনতা; কারো কারো মতে নিরাপত্তাহীনতা ও আর্থিক অনিশ্চয়তা।

> "আমার মনে হয় যৌনতা নয়, আর্থিক নিরাপত্তার অভাববোধ এই গল্পের দুটি প্রধান নারী চরিত্র চারুদর্শনা ও পরীরানীকে বিচিত্র আচরণে উদ্বোধিত ও চালিত করেছে।"[৬]

কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীন এবং তার স্ত্রী মহাশ্বেতার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'কুষ্ঠরোগীর বৌ' গল্প। বলদর্পী ব্যক্তির অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে বঞ্চিত-নির্যাতিতের মন থেকে যে হাহাকার-আর্তনাদ-অভিশাপ বেরিয়ে আসে, তা-ই একসময় অত্যাচারীর মনোব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা বংশানুক্রমে উত্তর-পুরুষের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। যতীনের বিশ্বাস- তার বাবা অনেক মানুষের সর্বনাশ ও অত্যাচার নিপীড়ন করে যে অর্থোপার্জন করেছেন, সে অভিশপ্ত-অর্থই তার শরীরে বাসা বেঁধেছে দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধির আকারে। নিজের রোগ নিয়ে যতীন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের এককোণে গুটিয়ে রাখে নিজেকে। সকলের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে কেবল মহাশ্বেতাকেই আঁকড়ে ধরে যতীন।[৭] ছোঁয়াচে ও দুরারোগ্য ব্যাধি হওয়া সত্ত্বেও মহাশ্বেতা যতীনের সকল আবদার পূর্ণ করে নির্বিকারচিত্তে। কিন্তু মহাশ্বেতার এত যত্ন-আত্তি সত্ত্বেও -

> "সঙ্কীর্ণ কারাগারে নিজের বিষাক্ত চিন্তার সঙ্গে দিবারাত্রি আবদ্ধ থাকিয়া যতীন দিনের পর দিন অমানুষ হইয়া উঠিতে লাগিল। বীভৎস রোগটা তাহার না কমিয়া বাড়িয়াই চলিল, তার সুশ্রী রমণীয় চেহারা কুৎসিত হইয়া গেল। বাহিরের এই কদর্যতা তাহার ভিতরেও ছাপ মারিয়া দিল। তার সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা একত্র থাকাও মুহ্যমনা মহাশ্বেতার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। ...কোণঠাসা হিংস্র জন্তুর মতো উগ্র ভীতিকর ব্যবহারে মহাশ্বেতাকে সে সর্বদার জন্য সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে শুরু করিয়াছে।" (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্যাধি মাত্রই যে শরীরের পাশাপাশি মানব মনেও বাসা বাঁধে তা যতীনের অব্যাহত আচরণের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুষ্ঠব্যাধি কেবল দেহ নয়, তার মনেও পচন ধরিয়ে দিয়েছে। দিনে দিনে মহাশ্বেতার প্রতি তার সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাড়তে থাকে, সন্তান হত্যার অভিযোগে সে তাকে অভিযুক্ত করে এবং মহাশ্বেতার পরিষ্কার পোশাক-পরিচ্ছদ ও স্বাভাবিক রূপসজ্জার মধ্যেও সে বিকৃতিকে প্রত্যক্ষ করে। যতীনের এই বিকারগ্রস্ত মন আস্তে আস্তে তাকে পাশব প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত করে। তার সঙ্গে ধর্মীয় স্থানে যেতে রাজি না হওয়ায় ক্ষিপ্ত জন্তুর মতো সে তার ব্যাধিগ্রস্ত হাত ঘষে দেয় মহাশ্বেতার শরীরে, যাতে মহাশ্বেতাও এ-রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে একসময় যতীনকে পুরোপুরিভাবে পরিত্যাগ করে মহাশ্বেতা। এতৎসত্ত্বেও যতীনের রোগমুক্তির জন্যে সে কালীঘাটে পুজো দেয় এবং পাঁচজন কুষ্ঠরোগীকে ধরে এনে প্রতিষ্ঠা করে কুষ্ঠাশ্রম। এই কুষ্ঠরোগীদের সেবা-যত্নের মধ্যেই মহাশ্বেতা খুঁজে ফেরে মানসিক প্রশান্তি। গল্পকারের মতে -

> "সুস্থ স্বামীকে একদিন সে ভালবাসিত, ঘৃণা করিত পথের কুষ্ঠরোগীদের। স্বামীকে আজ সে তাই ঘৃণা করে, পথের কুষ্ঠরোগাক্রান্তগুলিকে ভালবাসে। এতে জটিল মনোবিজ্ঞান নাই। সহজ যুক্তির অনায়াসবোধ্য কথা। মহাশ্বেতা দেবী তো নয়? সে শুধু কুষ্ঠরোগীর বৌ।" (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

প্রকৃতপক্ষে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত যতীনের বিকারগ্রস্ততা ও পাশবপ্রবৃত্তিই যতীনের প্রতি মহাশ্বেতার মনকে বিষিয়ে তুলেছে। তাই সে যতীন নয়, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার স্বীকৃতিস্বরূপ পথের কুষ্ঠরোগীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে কুষ্ঠাশ্রম। মধ্যবিত্ত জীবনের অপূর্ণ স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার প্রতীকী চিত্র 'সমুদ্রের স্বাদ' গল্প। এ-গল্প প্রসঙ্গে গল্পকার মানিকের ভাষ্য -

> "ভাবের আবেগে গলে যেতে ব্যাকুল মধ্যবিত্তদের নিয়ে 'সমুদ্রের স্বাদের' গল্পগুলি লিখা। প্রথম বয়সে লেখা আরম্ভ করি দুটি স্পষ্ট তাগিদে, একদিকে চেনা চাষী মাঝি কুলি মজুরদের কাহিনী রচনা করার, অন্যদিকে নিজের অসংখ্য বিকারের মোহে মূর্চ্ছাহত মধ্যবিত্ত সমাজকে নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়ে সচেতন করার। মিথ্যার শূন্যকে মনোরম করে উপভোগ করার নেশায় মর মর এই সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল।"[৮]

গল্পান্তর্গত স্বপ্নকাতর মেয়েটির সমুদ্র সন্দর্শনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল চোখের জলের নোনতা স্বাদে। ছোটবেলা থেকেই নীলার সখ ছিলে সমুদ্র দেখার। পিতার জীবদ্দশায় তার সেই সাধ পূর্ণ হয়নি; পিতার অবর্তমানে তো নয়ই। পিতা, মাতা কিংবা ভ্রাতার মৃত্যুর পর তার বিয়ে হয় এক অর্ধোন্মাদ ব্যক্তির সঙ্গে। এই স্বামীও তার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করেনি। এমতাবস্থায় সমুদ্রের কথা শুনলেই যেন তার দুচোখ দিয়ে বয়ে যায় সমুদ্রবান। দুঃখ, যন্ত্রণা আর অবিরাম অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে কেটে যেতে থাকে তার জীবন। 'গল্পটির বিষয় অভিনব। বর্ণনারীতি কবিত্বমণ্ডিত, রোমান্টিক বিষণ্ণতা এর মুখ্য পাত্রী নীলা চরিত্রের ভিত্তি।...কাল্পনিক হলেও সমুদ্রের সঙ্গে একটা বিশাল মুক্তির ভাবানুষদ গড়ে উঠেছে তার মনে। নিজের অশ্রুর লবণ-সমুদ্রেই সমুদ্রের স্বাদ চরিতার্থ হল। গৃহবদ্ধ নারীজীবনে অনেক সাধই যে এমনি 'রাধাঁর পর খাওয়া আর খাওয়ার পর 'রাঁধা'য় জলাঞ্জলি যায়, তার সাংকেতিক কাহিনীরূপে এর স্বাদ স্বতন্ত্র।'[৯] স্পষ্টত নীলা মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র। যাদের সাধ আর সাধ্যের কোন মিল নেই, সারাজীবন কেটে যায় দুঃখ-বঞ্চনায়, তাদের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা ও মুক্তির স্বপ্ন প্রতিভাত হয়েছে নীলা চরিত্রের মাধ্যমে।

সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার, যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বাস মানুষের মনে যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'হলুদ পোড়া'য়। ভৌতিক কুসংস্কার একজন বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষকে কীভাবে ধীরে ধীরে গ্রাস করে তার পরিচয় আছে এ-গল্পে। এই গল্পের শুরুটা খুবই নাটকীয়- স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংঘটিত দুটি অপমৃত্যুর ঘটনায় গ্রামজুড়ে শুরু হয় তোলপাড়। 'একজন মাঝবয়সী যোয়ান মদ্দ পুরুষ এবং ষোল সতের বছরের একটি রোগা ভীরু মেয়ে'। নিহত বলাই চক্রবর্তী এবং শুভ্রার মৃত্যুকে ঘিরে গ্রামে নানা জল্পনা-কল্পনা ও রটনার মাঝেই একদিন উঠানে আছড়ে পড়ে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দাঁতে দাঁত লেগে যায় বলাই চক্রবর্তীর ভাইপো নবীনের স্ত্রী দামিনীর। তখন গ্রামের সকলের বিশ্বাস হয় দামিনীকে ভূতে পেয়েছে। সবাই মিলে যখন ওঝা কুঞ্জ মাঝিকে খরব দেয় ভূত তাড়ানোর জন্য, তখন গ্রামের শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেন এতে প্রবল আপত্তি জানায়। কিন্তু ওঝা এসে দামিনীর ভূত তাড়াবার উদ্দেশ্যে দাওয়ার খুঁটির সঙ্গে তাকে শক্ত করে বেঁধে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে নাকের সামনে ধরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলে সে স্বীকার করে যে, সে শুভ্রা এবং বলাই খুড়ো তাকে খুন করেছে। তার এ স্বীকারোক্তি গ্রামের মানুষের মাঝে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানমনস্ক ধীরেনের বুদ্ধি ও বিবেচনাবোধও শিথিল হতে তাকে। স্কুলের ছাত্রদের পাঠদানের ক্ষমতাও সে ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলতে থাকে। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে প্রচলিত কুসংস্কারে সে আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তার বিশ্বাসের জগতে ঠাঁই করে নেয় অলৌকিক ও আধিভৌতিক বিচিত্র বিশ্বাস-সংস্কার। এই পর্যায়ে গ্রামে আবারও ওঝা আসে, তবে এবার শুভ্রার জন্য নয়, ধীরেনের জন্য, ভূত তাড়ানোর জন্য -

> "...তারপর মালসার আগুনে কাঁচা হলুদ পুড়িয়ে ধীরেনের নাকের কাছে ধরে বজ্রকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করল, কে তুই? বল তুই কে?
> ধীরেন বলল, 'আমি বলাই চক্রবর্তী, শুভ্রাকে আমি খুন করেছি।' " (হলুদপোড়া)

যুক্তিবাদী, শিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক মনকেও যে সংস্কারব্যাধি আমূল গ্রাস করে নিতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ধীরেন চরিত্র।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'আজ কাল পরশুর গল্প'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে (১৩৫০ বঙ্গাব্দে) বৃহৎবঙ্গে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী সময়ে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার তীব্র আকুতি, হাহাকার, যন্ত্রণা ও অসহায়তাকে সম্বল করে এক শ্রেণির মানুষ কীভাবে অর্থবিত্ত অর্জন করেছে সে কাহিনি বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এই গল্পে। দুর্ভিক্ষ শুরু হলে অর্থ ও খাদ্যের সন্ধানে গ্রামের উপার্জনশীল পুরুষ গ্রামত্যাগ করলে তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে গ্রামের বিত্তবানগোষ্ঠী। মানসুকিয়া গ্রামের রামপদ দুর্ভিক্ষের সময় অর্থের সন্ধানে গ্রামের বাইরে চলে গেলে তার স্ত্রী মুক্তার প্রতি কুদৃষ্টি পড়ে গ্রামের মোড়ল ঘনশ্যাম দাসের। কিন্তু খাদ্যের প্রলোভন দেখিয়েও মুক্তাকে বশীভূত করতে পারে না ঘনশ্যাম। অযাচিত লোভ-প্রলোভনের মধ্যে সম্ভ্রম রক্ষায় এ পর্যায়ে সমর্থ হলেও সাত মাসের শিশুপুত্রটিকে রক্ষা করতে পারে না মুক্তা। না খেতে পেয়ে মারা যায় তার শিশুপুত্র; সে চলে যায় সদরে। পরবর্তীকালে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এই দুঃসহ পরিস্থিতির যে বর্ণনা প্রদান করে মুক্তা তার প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ -

> "খোকন মরল, তোমার কোন পাত্তা নেই। দাসমশায় রোজ পাঠাচ্ছে নেড়ীর মাকে। দিন গেলে এক মুঠো খেতে পাই নে। এক রাতে দু'টো মদ্দ এলে, কামড়ে দিয়ে বাদাড়ে পালিয়ে বাঁচলাম এতটুকুর জন্য। দিশে মিশে ঠিক রইল না আর, গেলাম সদরে চলে।" (আজ কাল পরশুর গল্প)

গ্রামে ঘনশ্যাম দাসের কাছ থেকে কোনো রকমে সম্ভ্রম রক্ষায় সমর্থ হলেও সদরে গিয়ে তাকে সেই অনিবার্য পরিণতিকেই বরণ করতে হয়। কেবল মুক্তা নয়, অনেক চাষাভুষার স্ত্রী-কন্যা জীবনরক্ষার তাগিদে এই অন্ধকার বৃত্তে নিজেদের সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যারাই জীবনরক্ষার তাগিদে এই পথ বেছে নেয়, তাদের আর ফেরার উপায় থাকে না। সমাজের নানা প্রতিকূলতা সহ্য করে আপন পরিবারে ফিরে যেতে হলে তাদের সহ্য করতে হয় নানা প্রকার লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। তাই দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পরে মুক্তা যখন গ্রামে ফিরতে চায় তখন বাধা দেয় ঘনশ্যাম দাস। গ্রামে এ-নিয়ে বিচারসভা বসায় ঘনশ্যাম। এ-সভায় সাধারণ মানুষ মুক্তার পক্ষ নিলে প্রতিবাদের মুখে টিকতে পারেনি ঘনশ্যাম। সরোজমোহন মিত্রের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য লক্ষণীয় -

> "মহামারীতে লক্ষ লক্ষ দৈহিক মৃত্যু ঘটানোর মতো লোকে যদি কিছু বৌ-ঝিয়ের নৈতিক মৃত্যু ঘটিয়েই থাকে তা বলে সেই বৌ-ঝিরা এঁটো-কাঁটার মত পরিত্যক্ত হতে পারে না। তাদের নিয়ে আবার নতুন করে সংসার গড়ে উঠবে। নতুন আশায় ভাঙ্গা চোরা মানুষগুলো আবার বুক বাঁধবে। দুর্ভিক্ষে মন্বন্তরে হতবল মানুষ আবার নতুন উদ্যমে জেগে উঠছে এই বলিষ্ঠ সুরই আজ কাল পরশুর বড় কথা।"[১০]

যুদ্ধ ও মন্বন্তর একদিকে যেমন সাধারণ মানুষকে পতিত করে সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে, অন্যদিকে এই মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে একশ্রেণির বিত্তবান-ব্যবসায়ী গড়ে তোলে সিন্ডিকেট; কালোবাজারি, মজুতদারি, নারী ব্যবসার মাধ্যমে তারা রাতারাতি গড়ে তোলে টাকার পাহাড়। 'আজ কাল পরশুর গল্পে' এই বিষয়টি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন মানিক।

মন্বন্তর নিয়ে রচিত আরেকটি গল্প 'দুঃশাসনীয়'। ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের এই মন্বন্তর ছিল পুরোপুরিই মনুষ্যসৃষ্ট ও কৃত্রিম। এ-দুর্ভিক্ষে না খেতে পেয়ে লাখ লাখ মানুষ মারা গেলেও এ-নিয়ে কোনো দুশ্চিন্তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল না কালোবাজারিদের। সুযোগ বুঝে তারা চাল, তেল, নুন, কেরোসিন প্রভৃতি মজুত করে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। বস্ত্রের অভাবে আব্রুরক্ষা কষ্টকর হয়ে ওঠে; লজ্জায় মানুষ দিনের বেলায়ও ঘর থেকে বের হয় না, প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদনের জন্য বের হয় রাতে। দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে নারীলক্ষ্মীরা তিনবেলা কোনোমতে খেয়ে-না-খেয়ে বেঁচে থাকলেও বস্ত্রাভাবে নিজেদের মৃত্যুকামনা করে। গ্রামের আনোয়ারের স্ত্রী রাবেয়া বিশ্বাসই করতে চায় না দেশে বস্ত্র নেই। তাই সে স্বামীকে প্রশ্ন করে -

> "কাপড় যদি নেই, ঘোষবাবুর বাড়ীর মেয়েরা এবেলা ওবেলা রঙিন শাড়ী বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সাহেবের মেয়েরা চুমকি বসানো হাল্কা শাড়ীর তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়?" (দুঃশাসনীয়)

রাবেয়া বুঝতে পারে না বস্ত্রের এই সংকট কেবল সমাজের দরিদ্র-পীড়িত মানুষদেরই। বিত্তশালী-জমিদারদের বাড়ির বৌ-ঝিদের এই সংকট নেই। অবশেষে অনশনের জ্বালা সহ্য করে টিকে-থাকা রাবেয়া লজ্জা নিবারণের ব্যর্থতা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথে বেছে নেয়।

'মাসি-পিসি' গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও প্রতিবিধান-প্রসঙ্গ। স্বামীকর্তৃক নির্যাতিত পিতৃমাতৃহীন আহ্লাদী এবং তার দুই বিধবা মাসি-পিসিকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এই গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে সারা ভারতবর্ষে এ-গল্পে দুর্ভিক্ষের এই চিত্রাঙ্কনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার নিদারুণ সংগ্রাম ও বাস্তবতার চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় আহ্লাদীর পিতা আহ্লাদীর মাসি ও পিসিকে রক্ষার চেষ্টা না করলেও তারা নিজেদের চেষ্টাতেই বেঁচে যায় দুর্ভিক্ষ থেকে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী পর্যায়ে মহামারীতে আহ্লাদীর বাবা-মা-ভাই-বোন সবাই মারা যায়। স্বামীর অত্যাচার-নির্যাতন সইতে না পেরে পিতৃ-মাতৃহীন আহ্লাদী তখন এসে আশ্রয় নেয় মাসি-পিসির কাছে। দুই বিধবা মাসি-পিসি তখন মাতৃস্নেহে আশ্রয় দেয় আহ্লাদীকে। বেঁচে থাকার তাগিদে এবং সমাজের সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে গ্রাম থেকে সবজি কিনে শহরে নিয়ে বিক্রি করে মাসি-পিসি। আবার আহ্লাদীকে গ্রামে জোতদার, দারোগা এবং সর্বোপরি অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তারা গ্রহণ করে কার্যকর উদ্যোগ। পুরুষশূন্য গৃহে বিভিন্ন সময় গ্রামের জোতদার হানা দিলেও মাসি-পিসির তাৎক্ষণিক বুদ্ধিমত্তা ও সম্মিলিত প্রতিরোধে তারা পিছু হটে। দুর্ভিক্ষকালীন সংকট থেকে মাসি-পিসি যে প্রকৃতই বেঁচে থাকার প্রেরণা ও মন্ত্রণা গ্রহণ করেছে; এবং প্রতিবাদী সত্তায় উজ্জীবিত হতে শিখেছে তা-ই প্রদর্শিত হয়েছে এ-গল্পে। 'পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করতে হবে। গরীব বলে, স্ত্রীলোক বলে তারা দুর্বল নয়। অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে চাই সাহস, বুদ্ধি আর সংহতি। মাসি-পিসি একটি সাহসিকতার গল্প, প্রতিরোধের গল্প, আত্মনির্ভরশীলতার গল্প, জনজাগরণের গল্প।' [১১]

ইতিহাসখ্যাত তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পঞ্চাশের মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ে কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে কৃষকদের যে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কিছু রাজনৈতিক নেতা। 'হারানের নাতজামাই' গল্পে ভুবন মণ্ডল সেই নেতা, যে কৃষকদের পক্ষ নিয়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই পুলিশ ও জোতদাররা তাকে ধরার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

> "কৃষকনেতাকে গ্রেপ্তারের জন্য রাতের অন্ধকারে গ্রামে পুলিশের আগমন, পুলিশি তৎপরতার বিরুদ্ধে কৃষকদের জোটবদ্ধ হওয়া, জনশক্তির কাছে পুলিশের ভীতিবোধ প্রভৃতি চিত্র অতি সার্থকভাবে অঙ্কিত হয়েছে এ-গল্পে।"[১২]

ময়নার মা এ-গল্পের উল্লেখযোগ্য একটি চরিত্র। তার দৃঢ়তার কারণেই কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। পুলিশের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য ময়নার মা ভুবন মণ্ডলকে নিজের মেয়ের জামাই বলে পরিচয় দেয়। তার এই বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার কারণেই রক্ষা পায় ভুবন মণ্ডল। তাছাড়া সাধারণ কৃষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের কারণেও পুলিশ ভুবন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। মানিকের এ-বর্ণনাতেই পাওয়া যায় জোটবদ্ধ মানুষের শক্তিমত্তার পরিচয় -

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারানকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি, দলে দলে লোক ছুটে আসে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড় হচ্ছে। ...রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। ...মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।" (হারানের নাতজামাই)

সাধারণ নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাহলে কোন শক্তিই পারে না তাদেরকে আটকাতে। এই বাস্তবতাই প্রমাণিত হয়েছে 'হারানের নাতজামাই' গল্পে।

'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' গল্পটি রচিত হয়েছে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। কৃষকদের তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে 'হারানের নাতজামাই' নামক যে-গল্পটি রচিত হয়েছিল, তারই পরবর্তী পর্যায়ে কারখানার শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় এই গল্পটি। কৃষকদের আন্দোলন-সংগ্রাম যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, তখনই ছোট বকুলপুরের কারখানার শ্রমিকরা শুরু করে ধর্মঘট। ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে পুলিশ যখন কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে চালান দেয়ার উদ্দেশ্য ট্রেনে তুলে, তখন সম্মিলিতভাবে শ্রমিকরা এতে বাধা দিলে পুলিশ তাদের ওপর গুলি চালায়। পুরো এলাকা হয়ে ওঠে রণক্ষেত্র। এরকম পরিস্থিতিতে হাওড়া থেকে স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছোট বকুলপুরের উদ্দেশ্য যাত্রা করে দিবাকর। তাদের কথা শুনে সহযাত্রীরা অবাক হয়। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির ভালো-মন্দ সংবাদ পেতে হলে ছোট বকুলপুর যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় নেই। কিন্তু ট্রেন থেকে নামার পরই তারা সশস্ত্র পুলিশদের তল্লাশির শিকার হয়। পুলিশ তল্লাশি করে দিবাকরের পানে মোড়া কাগজটা দেখে আঁতকে উঠে। এই নাটকীয় ঘটনার বর্ণনা গল্পকার দিয়েছেন এভাবে -

> "কাগজটা ভালে করে মেলে ধরে সে বিস্ফরিত চোখে বড় হরফের হেডলাইনটার দিকে চেয়ে থাকে। - 'ছোট বকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি'।
> নিগূঢ় আবিষ্কারের উত্তেজনায় কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাওয়া গেছে। ইস্তাহার পাওয়া গেছে।'
> ইস্তাহার? তাই বটে। বিপজ্জনক ইস্তাহার! যদিও দুমড়ে মুচড়ে চুন আর পানের রসে মাখামাখি হয়ে গেছে তবু চেষ্টা করে আগাগোড়া পড়া যায়। পড়তে পড়তে চোখও কপালে উঠে যায়।" (ছোট বকুলপুরের যাত্রী)

নাটকীয়তায় ভরপুর এ-গল্পের শেষটা কৌতুকময়তায় পরিপূর্ণ। যারা ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, সেসব জমিদার-জোতদার-পুলিশও ভীতির ঊর্ধ্বে নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পানের প্যাকেটে ইশতেহার দেখে তাদের চমকে ওঠা দেখে। সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধ যে শোষকদের মনে কীভাবে ভয়ের কাঁপুনি ধরাতে সক্ষম তার বাস্তব উদাহরণ এ-গল্পটি।

> "বাঁকা চোখে একটি নির্মম অভিজ্ঞতাকে অপূর্ব শিল্পায়নের যে মুন্সীয়ানা মানিক এই গল্পে দেখিয়েছেন তা এক কথায় অপূর্ব। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক এবং নাটকীয়তায় গল্পটি চমৎকার হয়েছে।"[১৩]

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রধান আকর্ষণ তাঁর ভাষাভঙ্গি। সহজ-সরল, ইঙ্গিতধর্মী, প্রতীকী-চিত্রকল্পময় ভাষাযোগে তিনি গল্পকে নিয়ে যান পরিণতির দিকে। অবশ্য তাঁর গল্পে প্রকরণের চেয়ে শেষাবধি বিষয়ই হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। নির্ভার, কবিত্বময় ও স্ফটিকস্বচ্ছ ভাষা ও অলংকার বিন্যাসে মানিকের ভাষা হয়ে উঠে ভিন্নস্বাদী ও চিত্তাকর্ষক।

সাধু এবং চলিত-দুই রীতিতেই গল্প লিখেছেন মানিক। প্রথম ও শেষ গল্পগ্রন্থ ছাড়া তাঁর প্রায় সব গ্রন্থই সাধুরীতিতে রচিত। অবশ্য সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করেছেন বাস্তবসম্মত চলিত, কথ্য বা আঞ্চলিক ভাষা। যেমন -

> " 'পাঁচী পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। তারপর ভিখুর হাত ধরিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া উঠিল। পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ভিখু বলিল, 'অখনই চান্দ ইঠব পাঁচী'।
> পাঁচী বলিল, 'আমরা যামু কনে?'
> 'সদর। ঘাটে না' চুরি করুম। বিয়ানে ছিপতিপুরের সামনে জংলার মদ্যি ঢুইকা থাকুম, রাইতে একদম সদর। পা চালাইয়া চ' পাঁচী, এক কোশ পথ হাঁটন লাগব।" (প্রাগৈতিহাসিক)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 190 - 199
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানিকের ভাষা ব্যবহারের অন্যতম বিশেষত্ব সাংকেতিক ভাষার বহুল ব্যবহার। অনেক গল্পেই সংকেতময় ভাষা ব্যবহারে মানিক প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ কৃতিত্ব। একটি দৃষ্টান্ত -

> "হয়তো ওই চাঁদ আর এই পৃথিবীর ইতিহাস আছে। কিন্তু যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচী পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক, পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই, কোনোদিন পাইবেও না।" (প্রাগৈতিহাসিক)

বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলাদা বিশেষত্ব রয়েছে। মনোভাব প্রকাশের প্রয়োজনে মানিক প্রায়শ স্বল্পদৈর্ঘ্যের বাক্য ব্যবহার করেছেন। অবশ্য দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহারেও মানিক ছিলেন স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। যেমন -

> "দেবতা একদিন যার কাছে ছিল অলস কল্পনা, ধর্ম ছিল বার্ধক্যের ক্ষতিপূরণ, জ্ঞান ছিল অনমনীয় যুক্তি, আজ সে আশা করিতে আরম্ভ করিয়াছে দেবতার যদি দয়া হয়, হয়তো আবার সুস্থ হইয়া ওঠার পথ দেবতাই তাহাকে বলিয়া দিবেন।" (কুষ্ঠরোগীর বৌ)

গল্পে অলংকার ব্যবহারে মানিক ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত। বক্তব্য বিষয়কে জ্ঞাপনের প্রয়োজনে তিনি এমনকিছু অলংকার ব্যবহার করেছেন যেগুলো যথার্থই চমকপ্রদ। বিশেষ করে উপমার ব্যবহারে তিনি প্রদর্শন করেছেন অসাধারণ পাণ্ডিত্য। যেমন -

১. দালানের আনাচে-কানাচে ঝড়ো হাওয়া যেমন গুমরে গুমরে কাঁদে, দামিনী আওয়াজ করতে লাগল সেই রকম। (হলুদ পোড়া)

২. কচি ডাল ভাঙিয়া ফেলিলে শুকাইয়া যেমন হয়, কতকটা সেইরকম শুষ্ক ও শীর্ণ চেহারা অনাদির, ব্রণের দাগ-ভরা মুখের চামড়া কেমন মরা-মরা, চোখ দুটি নিষ্প্রভ, দাঁতগুলি খারাপ। (সমুদ্রের স্বাদ)

৩. জোঁকেরা তাহার রক্ত শুষিয়া শুষিয়া কচি পটোলের মতো ফুলিয়া উঠিয়া আপনা হইতেই নিচে খসিয়া পড়িয়া যায়, সে টেরও পায় না। (প্রাগৈতিহাসিক)

রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বাতন্ত্র্য সম্পাদন করেছেন তার দ্বিতীয় তুলনা বিরল। বাস্তববাদী সাহিত্যের অসামান্য রূপকার তিনি। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সহযোগ-সন্নিপাতে যে গল্পভুবন তিনি নির্মাণ করেছেন তা যথার্থই দৃষ্টিনন্দন ও মনোগ্রাহী। তিনি স্বল্পজীবী হলেও তাঁর গল্পসাহিত্য চিরজীবী।

Reference:

১. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৯
২. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি*, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১১৩
৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩২৮
৪. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩৬
৫. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা*, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১৪৬
৬. বসু, কৃষ্ণা, *আন্তর্জাতিক ছোটগল্প ও সমাজজিজ্ঞাসা*, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৬
৭. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ.১৮১
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, লেখকের কথা, *সমুদ্রের স্বাদ*, দি বুকম্যান, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৫২
৯. গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ, *মানিক-সাহিত্য সমীক্ষা*, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৩১
১০. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২
১১. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
১২. হক, সৈয়দ আজিজুল, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প: সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০০
১৩. মিত্র, সরোজমোহন, *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩